চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ও বিমল করের স্বকীয়তা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সাহিত্যের আঙিনায় বিমল কর প্রবেশ করেন ছোটগল্পের হাত ধরে। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা, অপর দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উচ্ছ্বাস, একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি সমর্থন, অন্যপক্ষে বিরোধিতা, একদিকে অর্থাভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অপরদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মন্বন্তর -- কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই সময়কালকে ও ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে যাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে বিমল কর অগ্রগণ্য সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত। বিমল কর ছাড়াও সেই সময়ে বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য গল্পকার হিসেবে বর্তমান ছিলেন। ছোট গল্পের দিক থেকে আমরা তাঁদের যে পরিচয় পেয়েছি তাই এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। যুগ ও জীবনের ছায়া তাঁদের গল্পেও প্রকশিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের কারণে একই বিষয়বস্তু বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়, এবং আত্মোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যে ভিন্ন মাত্রার স্বাক্ষর রাখে শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে। এ কারণে গল্পে প্রতিষ্ঠিত কাহিনী, চরিত্রের বিকাশ, রসপরিণতি, মননধর্মিতা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, প্রেমভাবনা, মৃত্যুচেতনা ইত্যাদি যে কোন দিক দিয়ে সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা গেলেও জীবনদৃষ্টির তারতম্যে বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়।

বিমল করের সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, কমল কুমার মজুমদার, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নবেন্দু ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক বিশিষ্ট গল্পকার। সকল গল্পকার বয়সের মাপকাঠিতে বিমল করের সমবয়স্ক না হলেও সাহিত্য রচনার দিক থেকে এঁরা ছিলেন সমসাময়িক এবং জনপ্রিয়তার অধিকারী। বিমল করের গল্পে উপস্থাপিত তৎকালীন সমাজচিত্র, ব্যক্তিজীবন মানব সম্পর্কের রসায়নের ক্ষেত্রে এই গল্পকারদের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল পরিলক্ষিত হয়।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বিমল করের পূর্ববর্তী লেখক। তিনি কল্লোল-কালিকলম পত্রিকার সমকালে সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় দেহজ প্রেম, মনস্তত্ত্ব, সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত

বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে নিরাসক্ত, নির্মোহ ভাব লক্ষিত হয়। প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা, রূঢ় বাস্তবতা, প্রেমের ক্ষেত্রে দেহবাদিতার প্রতিষ্ঠা তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনে নিয়তির প্রবল পরাক্রম এবং তার মাধ্যমে মানুষের জীবনে হাহাকারের প্রতিধ্বনি তাঁর রচনায় উল্লিখিত। 'হাড়', 'দিবসের শেষে', 'অপহৃত আকাশ কুসুম', 'পল্লীশ্মশান', 'রতি ও বিরতি' প্রভৃতি গল্পে সেই চিত্র প্রকাশিত।

'হাড়' গল্পে নিয়তির প্রভাব সক্রিয়। সনাতন একজন পরিশ্রমী মানুষ, সে মৎস শিকার করে জীবনধারণ করে। তার স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় সন্তানকে রসি বুড়ির কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সনাতন রসি বুড়িকে পছন্দ করেনি। গ্রামের মানুষ জনও তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করে। রসিবুড়ির সাথে সনাতনের ঝগড়া হলেও শিশুর মুখ চেয়ে রসিবুড়ি সব কিছু মেনে নেয়। একদিন রাগ করে সে সনাতনকে বলে ফেলে-- 'তুই মাছ মারতে চলেছিস -- ওই মাছই যেন আজই তোকে মারবে।'[১] এরপর মাছ খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা আটকে গিয়ে সনাতন মারা গেছে। গ্রামের লোক রসি বুড়িকে ডাইনি সন্দেহ করলেও এর পিছনে যে নিয়তির প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরী, তা উপেক্ষা করা যায় না। এর প্রভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

'দিবসের শেষে' গল্পে অমোঘ নিয়তির কাছে নিরুপায় মানবজীবনের পরিণতির ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। রতি নাপিতের একমাত্র ছেলে পাঁচু। রতির স্ত্রী নারাণীর তিনটি ছেলে প্রসবগৃহেই মৃত হওয়ায় পাশের কামদা নদীতে ফেলে দিতে হয়েছিল। এর পর পাঁচু গোপালের মাদুলি ধারণ করে সে পাঁচুকে পেয়েছে। এই কারণে মায়ের শঙ্কিত মন সর্বদা একমাত্র প্রদীপ, পাঁচুকে ঘিরে থাকে। মনের আশঙ্কায় জন্ম নেয় পাঁচুকে ঘিরে অমঙ্গল চিন্তা ''দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ একসময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে -- তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারাণীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই -- এমনি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।''[২] সেই পাঁচু একদিন সকালে বলেছিল, 'মা আজ আমায় কুমিরে নেবে।' নারাণীর বুক সহসা কেঁপে উঠলেও পরবর্তী সময়ে মনে হয়েছে এটা অসম্ভব। কামদা নদীর কাছে তারা অত্যন্ত পরিচিত এবং এযাবৎকাল সেখানে কুমিরের আবির্ভাব ঘটেনি। এই নদী তাদের কাছে মমতাময়ী, পালয়িত্রী। দিন গড়ানোর সাথে সাথে পাঁচুর ভয় বেড়ে গেছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে তার বাবার সাথে দুপুরে নদীতে গিয়ে নিরুপদ্রবে স্নান করে এসেছে। দুপুরবেলা সঙ্গীদের সাথে লুকিয়ে কাঁঠাল খেয়ে তার রসে গা ভিজিয়ে ফেলায় নারাণীর কথায় রতি নাপিত শেষ-বিকেলে পাঁচুকে নিয়ে নদীতে গেছে গা পরিষ্কার করে আনতে।

ফিরে আসার সময় পাঁচুর নজর পড়েছে নদীর পাড়ে সে ঘটটা ফেলে এসেছে। সেই ঘট ফিরিয়ে আনতে গিয়ে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সে। ''যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।''[৩]

জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়। এই নিয়তির অনিবার্যতা মানুষের জীবনের সুখ-স্বস্তিকে নিঃশেষিত করে দেয়। গল্পের সূচনায় পাঁচুর মনে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা ঘটল। সে যদিও নদীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমোঘ শক্তির বলে নিয়তি তাকে পরাভূত করল। নিয়তির এই প্রভাব এবং তার কার্যকারিতা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তাই দুপুরের স্নান কিংবা বাবার সাথে বিকেলে নদীতে যাওয়া, কোন ক্ষেত্রেই তার কাছে নদী কিংবা কুমির সম্পর্কিত ভয়ের ভাব বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কিন্তু পাড়ে ঘট বসে থাকা, এবং তার প্রতি পাঁচুর এগিয়ে যাওয়া যেন মানুষের জীবনের নিয়তিতাড়িত রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখানে গল্পের শুরুতে যেমন পাঁচুর মৃত্যু-সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়েছে, তেমনি বিমল করের 'নিষাদ' গল্পেও লক্ষ্য করা যায় গল্পের সূচনাতেই তিনি নিয়তির অনিবার্যতার দ্যোতনা করেছেন -- ''ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ... কিংবা কাল...।''[৪] 'জলকু' --বছর বারোর ছেলেটি মনের আক্রোশ মেটানোর প্রচেষ্টায় অবিরাম রেল লাইন লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে চলেছে। সে ভেবেছে তার ছাগলছানা মানিককে হত্যা করেছে এই রেল। কিন্তু সে জানে না তাদেরই প্রতিবেশী, এই গল্পের কথক সাধের ফুলচারা খেয়ে যাওয়ার অপরাধে মানিককে শাস্তি দিতে গিয়ে অসাবধানে হত্যা করে ফেলেছে। অথচ গল্প কথক নিজের এই অপরাধ স্বীকার করেনি জলকুর কাছে। কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে তাজা একটি কিশোরের প্রাণ। নিয়তি এখানেও অনিবার্য, জলকুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাকে ঠেকানো যায়নি। গল্প কথক যেন এখানে নিয়তির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছে। জলকুর মৃত্যুর জন্য কিছুটা দায় তারও, একারণেই সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়ে জলকুর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, নিজের অন্তরসত্তায় তার ভাঙন ধরেছে। ''মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধ হয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে।''[৫] নিয়তির অনিবার্যতা এই গল্পে প্রকাশিত হলেও তার পাশাপাশি অন্তর্দ্বন্দ্বময় মানুষের হৃদয়ের ছবিকেও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অশ্বত্থ' কিংবা 'আয়োজন' গল্পে নিয়তির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর সন্তান মারা যাওয়ার পিছনে তার মনোগহনে অশ্বত্থের

প্রভাব কল্পিত হয়েছে। তার মনে হতো, 'ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে!'[৬] --এই সম্ভাবনা একদিন অনিবার্য যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল রেণুর বুক খালি করে দিয়ে। 'আয়োজন' গল্পে মনোবীণা'র সন্তান-সম্ভাবনা গর্ভেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্তান-হীনতার যন্ত্রণা নিয়ে সে তাকিয়ে থাকত সেই সিঁড়ি গুলোর দিকে, যেখানে বেশ কয়েক বছর আগে পড়ে গিয়ে তার মাতৃ-সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

জগদীশ গুপ্ত নিয়তির এই আগ্রাসী মনোভাবের কাছে মানুষের কোন ভূমিকা দেখেননি। মৃত্যুভাবনা মনের মধ্যে জাগ্রত থাকায় বিমল করও নিয়তির লীলার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন নি, এবং তিনিও মেনে নিয়েছিলেন, এই নিয়তি অনিবার্য, এর বিরোধিতা চলে না। 'বুদবুদ' গল্পে তাই বেলা শ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত নিজের শিশুর মৃত্যুতে প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়নি। জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ প্রায় অনুপস্থিত। প্রেম এখানে দেহজ এবং তীব্র যৌনচেতনার মাধ্যমে তার প্রকাশ। স্বার্থ, ভোগসর্বস্বতা, কুণ্ঠাহীন যৌনক্ষুধা তাঁর গল্পগুলিকে রূঢ় বাস্তবের প্রতিচিত্র করে তুলেছে। মানুষের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষার নগ্নরূপ তিনি নিরাসক্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশ্লীলতা প্রকাশের বাসনা এর মধ্যে নেই, মানুষের মনের স্বরূপ প্রকাশেই তিনি নিঃশঙ্ক, অকৃত্রিম মানসিকতার অধিকারী। 'অরূপের রাস' গল্পটিতে প্রেম থাকলেও যৌনক্ষুধার কদর্য রূপ স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। অবদমিত সেই ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে কিছুটা মৃদুভাবে।

গল্পের কথক কানুর সাথে রাণুর বন্ধুত্ব ছিল। শৈশব কৈশোরের ছেলেমানুষীর দিনগুলি অতিক্রম করে বয়ঃসন্ধির লগ্নে এসে পৌঁছল তারা। ছেলেদের থেকে মেয়েদের মানসিক পরিবর্তন, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণী ক্ষমতা যে অনেক বেশি এই গল্পে তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই উভয়ে উভয়ের দেহ স্পর্শ করার পর রাণুর মনে পুলক সঞ্চারিত হলেও, কানুর মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। রাণুর বিয়ের কথা শোনার পর ভালবাসাকে টিকিয়ে রাখার দুর্বার মানসিকতায় কানুর মনে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় না। এমনকি রানুর রান্না করা খাবার খেয়েও ভালবাসার রসায়ন বোঝার ক্ষমতা তার নেই। রাণু আশা করেছিল কানুর মনেও তার মত ব্যগ্রতা, উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাবে, সে জায়গায় কানু নিস্পৃহ, নির্মোহ। রাণুর বিয়ের সম্বন্ধে সে 'বিবাহ' কবিতা লিখেছে বসেছে, কিন্তু বিবাহের পিছনে রোমহর্ষ অনুভব করতে পারেনি। বিয়ের পরও রাণু চিঠি লিখেছে, কিন্তু কানুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। সময়ের প্রবাহের সাথে সাথে কানুর বিয়ে হয়েছে এবং স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রাণুর। রাণুরও সন্তান হয়েছে, সেই ছেলের নাম রেখেছে 'বেণু'। এই নামের পিছনে

তার নামের মিল আছে কিনা তা নিয়ে কানু সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এরপর রাণু ইন্দিরার সাথে নিবিড় ভাবে মেলামেশা করেছে। কানুর প্রতি তার অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর যেন রেখে দিতে চেয়েছে ইন্দিরার মাধ্যমে। রাণুর সমকামিতার প্রকাশ এখানে ইন্দিরার মনেও লজ্জার সৃষ্টি করেছে। আর কানু মনে করেছে রাণু যেন, ''ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ...আমি তৃপ্ত।''[৭] --এই গল্পে রাণুর মধ্যে প্রেমবোধের নানা প্রকাশ ঘটলেও কানু নির্জীবের মতো আচরণ করেছে। সময়ানুগ ভাবে তার মনে প্রেমবোধের প্রকাশ ঘটেনি। আবার রাণু স্পষ্টভাবে তার ভালবাসার কথাকে ব্যক্ত করতে পারেনি। মনের গোপনে সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে লুকিয়ে রেখেছে। ইন্দিরার সাথে মেলামেশা, রাতে শোওয়ার আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে সমকামিতার অস্বাভাবিক আচরণে তৃপ্ত হতে চেয়েছে।

বিমল করের 'উদ্ভিদ' গল্পে অবদমিত প্রেমের স্বরূপ কিছুটা ভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বটানির অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশের গোপন, অস্বাভাবিক ভালবাসা, বিকৃত কামনাকে প্রকাশ করেছে। পাথরের মূর্তির উপর অলংকরণ তারই যথার্থ প্রকাশ। ছাত্রী চন্দ্রার কাছে সে নিজের এই অব্যক্ত ভালবাসাকে প্রকাশ করতে পারেনি। চন্দ্রার বিয়ের রাতে বাগানের স্ট্যাচুকে আঁকড়ে ধরে অবদমিত, বিকারগ্রস্ত মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। তার এই বিকৃত মানসিকতা মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে মেলেনা। রাণী সুবর্ণমঞ্জরী একারণেই তাকে উদ্ভিদ বলেছেন। যে পুরুষ নিজের প্রেমের উপলব্ধিকে সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত না করে অসহায়ভাবে গোপনে মানসিক অসুস্থতার দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং লতানো উদ্ভিদের মতো জড়বস্তুকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চায়, সে তো উদ্ভিদের মতোই। পূর্ণেন্দুবিকাশ নিষ্প্রাণ নগ্ন স্ট্যাচুটিকে আলিঙ্গন করে সুখ পেতে চেয়েছে-- ''যে সুখে এমন স্তব্ধরাতেও একটি লতা চুপি চুপি তার সবুজ ডগা তিল তিল করে বাড়িয়ে একটি অদ্ভুত কামনাকে প্রকাশ করেছে।''[৮]

পূর্ণেন্দুবিকাশের মনে এই উদ্ভিদসত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবদমিত এই প্রেমাকাঙ্ক্ষা তার বিকৃত রুচির পরিচায়ক। 'অরূপের রাস' গল্পের সাথে এর সার্থক মিল লক্ষিত হয় না। তবু রাণুর অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ইন্দিরাকে নিয়ে সুখ পাবার প্রচেষ্টা কিছুটা বিকৃত মানসিকতার সাক্ষ্যবাহী। কানুর নির্মোহ মানসিকতা, বয়ঃসন্ধিকালে সেই ভালবাসাকে বুঝতে না পারার মানসিক প্রতিবন্ধকতা কিছুটা পূর্ণেন্দুবিকাশের চরিত্রের সমধর্মী।

মানব মনে মূল্যবোধের সঙ্কট জগদীশ গুপ্তের গল্পে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'আদি কথার একটি' গল্পে বিধবার শিশু-কন্যাকে বিয়ে করার পিছনে কন্যা এবং তার মা দুজনকেই ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি তীব্র আসক্তি এবং তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরে নিজেকে বঞ্চিত করার পিছনে অবদমিত কামনার প্রকাশ ঘটেছে 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' গল্পে। নিজের স্ত্রী সুন্দরী নয় বলে পুত্রবধূকেও অসুন্দরী মনোনীত করার পিছনে কামনার গ্লানি প্রকাশিত হয়েছে 'লোকনাথের তামসিকতা' গল্পে। 'পৃষ্ঠে শরলেখা' গল্পে আবার দেখা যায় পুত্রবধূ নির্বাচন করতে গিয়ে পৌঢ় নিজেই বিয়ে করে বসে এবং পুত্রকে ভৎর্সনা করে তাকে মাতৃ সম্মান না দেওয়ার কারণে।

'যযাতি' গল্পে বিমল কর মানুষের অন্তর্জগতের বাসনার বিষয়কে মূর্ত করে তুলেছেন। যযাতির মিথের সাথে এই গল্পের নীলকণ্ঠের মানসিকতাকে তিনি মিলিয়ে ফেলেছেন। সে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পালা লিখতে বসে কোনভাবেই সফল হয় না। মনের মধ্যে শূন্যতাকে সে দূর করতে পারে না। ফাঁকা বাড়িতে স্ত্রীর কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করে আঠার বছরের কুসুম। রান্না কিংবা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর কাজের মধ্যে নিরত থাকা কুসুমকে দেখে নীলকণ্ঠ ভুলে যায় ছেলে ললিতের সাথে কুসুমের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সে নিজের মনে সঙ্গোপনে প্রত্যাশার জগৎ তৈরি করে ফেলে। রাত্রে ললিত ঘরে ঢুকে বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে বলে-- 'একটা বিয়া করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।'[৯] ব্যক্তির মূল্যচেতনার সংকট নীলকণ্ঠ চরিত্রের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মনের গভীরে অবচেতনে লালন করা প্রবৃত্তিকে এখানে রূপ দিয়েছেন লেখক।

জগদীশ গুপ্তের 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পেও মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ প্রবণতা, কদর্য চিন্তা মানুষের মনকেও কেমন ভাবে বিষিয়ে দেয়, তার প্রকাশ এই গল্প। অভয়া তার মেয়ের সাথে স্বামী অতুলের সম্পর্ককে সুস্থভাবে দেখতে পারে না। মেয়ে শান্তিময়ী বাবার সাথে সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করে, যেখানে, খেলাধূলা, নাটক এমনকি প্রেমের বিষয়ও বাদ পড়ে না। এই আলোচনার মাধ্যমে তাদের আত্মিক সহাবস্থান দৃঢ় হলেও তার মধ্যে কামনা নেই, আছে সহযোগিতা, সাবলীলতা। কিন্তু অভয়া মেয়ে ও বাবার এই মেলামেশা পছন্দ করে না। আবার বাধা দিয়েও সফল হয় না। কারণ দুজনের উচ্ছ্বাসের তোড়ে তার তৈরি করা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙে যায়। অভয়া শঙ্কিত হয়ে অতুলকে জিজ্ঞাসা করে, 'মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো

তো?' --এই প্রতিবাদ মুখরতা পরবর্তী সময়ে আরও রূঢ় রূপ ধারণ করে। ''তার মনে হইতে লাগিল, পাপের পায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে; তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধকার, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ; কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সংবিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে ...।''[১০] তাই সে শান্তির কাছে নিজেদের সম্পর্ককে প্রকাশ করে শান্তিকে তার বাবার কাছ থেকে দূরে সরাতে চেয়েছে। অভয়া একদিন অতুলের সাথে কুলত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল। শান্তি অতুলের সন্তান নয়। যে মানুষ অভয়াকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, সেই পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। তার লোভের থাবা হয়তো শান্তির দিকেও প্রসারিত হতে চেয়েছে।

অভয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের 'আত্মজা' একটু ভিন্নধর্মী গল্প হলেও বাবা ও মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে মায়ের অকারণ সন্দেহপ্রবণতা সেই গল্পেরও বিষয়বস্তু। 'আত্মজা'তে হিমাংশু ও পুতুল আত্মজা সম্পর্কিত। 'শঙ্কিতা অভয়া'য় তা নয়। 'আত্মজা' গল্পে বাইরের লোকের দ্বারা যুথিকা প্রভাবিত হয়েছে এবং হিমাংশুকে আক্রমণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে হিমাংশুর মর্মান্তিক আত্মহত্যা পরিণতি টেনেছে গল্পের। হিমাংশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিজের শুভবোধকে লালন করার প্রত্যাশা, পুতুলকে ঘিরে তার মমত্ববোধ ও হাহাকার 'আত্মজা' গল্পকে অসাধারণ উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছে।

জগদীশ গুপ্তের কিছু গল্পে দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমিজাত ক্লান্তি ও তার মাধ্যমে হতাশা প্রকাশিত হয়েছে। 'মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল' কিংবা 'আঠারো কলার একটি' প্রভৃতি গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'আঠারো কলার একটি' গল্পে বেণুকর দাম্পত্য জীবনের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। চারবছরের বিবাহিত জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক তার কাছে অভ্যাসগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণহীন হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর কাছে সে আরও কিছু ছলা কলার প্রত্যাশা করে।, যা তার দাম্পত্য জীবনে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগাতে পারে। স্ত্রী জানকী জানতে পেরে বলে, 'তা আশ্চর্য কী এমন! দেখাইনে তাই দেখ না।'[১১] এরপর আকস্মিকভাবে শুকনো মাঠে লাঙল করতে গিয়ে বেণুকর একটি জ্যান্ত মাগুর মাছ পায় এবং বাড়িতে নিয়ে এসে তা ঝোল করতে বলে আবার মাঠে ফিরে যায়। দুপুরে খতে বসে মাছের ঝোলের কথা জিজ্ঞাসা করলে জানকী যেন আকাশ থেকে পড়ে। তাদের চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা এলে বেণুকরের কথা শুনে তারা বুঝতে পারে তার 'মাথা বিগড়েছে'। কারণ এই শুকনো মাঠে মাগুর মাছ পাওয়া অসম্ভব। প্রতিবেশীরা চলে গেলে জানকী বলেছে,

''আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না! এ তারই একটি। _রাগ করো না, তোমার পায়ে ধরি।' ব'লে জানকী স্বামীর পা ধরে বলল, 'মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দিগে।''[১২]

রুক্ষ, তিক্ত জীবনবোধের মধ্যেও এই গল্পটিতে সরসতা দেখিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত। জীবনের একঘেয়েমির কারণে ক্লান্তিবোধ, হতাশা, তার থেকে বেরোনোর চেষ্টা, কিন্তু তার মধ্যেই আটকে পড়ার মতো আধুনিক বিষয় এই 'আঠারো কলার একটি' গল্পতে রয়েছে। বিমল করের 'পালকের পা' গল্পে মৃণালের কাছে তার স্ত্রী কমলা একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল তার সাজপোষাক, চটকদারিত্বের অভাবের কারণে। সে পাশাপাশি লক্ষ্য করেছিল তার বান্ধবী তুষারকণার আধুনিকত্ব ও মনমোহিনী ভাবমূর্তিকে, যার কাছে তার স্ত্রী নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু একদিন সে তুষারকণার রক্তাক্ত হৃদয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারল, যেখানে শুধুই কৃত্রিমতা রয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পেল কমলার ইচ্ছাকৃত অভিনয়ের স্বরূপ, যেখানে জীবনের সেই স্বাভাবিকত্ব, সহজবোধ্যতা, সরলতা ও অকৃত্রিম ভাব ছিল না। কমলা মৃণালের মনোরঞ্জনের জন্য বলেছে, ''এতেও যদি না হয়, আরও পারি।' কমলা আঁচলটা খুলে ফেলল গা থেকে। হাত ধরে ফেলল মৃণাল খপ্ করে। আশ্চর্য এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার গা। গলার স্বর ফুটছিল না। তবু বলল, 'না না। লক্ষ্মীটি না।''[১৩]— মৃণাল নিজের স্ত্রীর মধ্যে অনুভব করেছে ঘরোয়া সুশৃঙ্খল মানসিকতা, যা তার কাছে অবসরের একমাত্র সুখ ও স্বস্তি এনে দিতে পারে। তাই বৈচিত্র্যের খোঁজ না করে অপরের প্রতি ঈর্ষাকাতর না হয়ে নিজ পরিধির মধ্যে ফিরে এসেছে। বিমল কর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সুখের বাতাবরণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহ্য, সুস্থ মানসিকতা, চিরন্তন প্রেমের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ও আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। জগদীশ গুপ্ত মানুষের অন্তর-মনের ক্লেদাক্ত স্বরূপকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রেমের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন প্রবৃত্তির টানাপোড়েন। নৈরাশ্যবোধ, গ্লানি, বিকারগ্রস্ত মানসিকতার প্রকাশ রয়েছে তাঁর গল্পের মধ্যে। বিমল কর সমকালীন মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করলেও সুখের সন্ধান দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২) বিমল করের অগ্রজ কথাশিল্পী, কল্লোল যুগ থেকে একাদিক্রমে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। বিমল করের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্কও ছিল। তারাশঙ্করের গল্পে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলেও তা আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও মানুষের ছবি সমগ্র জীবনের বৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। মানব চরিত্র ও মানব জীবনের সাথে তাঁর ওতপ্রোত যোগাযোগ তাঁকে যেমন রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা দিয়েছিল,

তেমনি সাহিত্যকেও করে তুলেছিল বাস্তবসম্মত। কল্লোলীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য-ভাবনাকে গড়ে তোলেননি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন, ''আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। ...আমার মনে ভেঙে গড়ার স্বপ্ন ছিল।''('আমার সাহিত্য জীবন'-- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের অবহেলিত জীবনচিত্র, নিম্ন অধ্যুষিত মানুষের ধর্মীয় সংস্কার, জমিদারি প্রথার অবক্ষয় ও বিলোপ, নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব, নিয়তির অমোঘ নিয়মে আক্রান্ত জীবনচিত্র তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। ''আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর দেখেছেন--মানুষের আদিম অপরাধ- প্রবণতা, দেহমনের কুৎসিত ব্যাধি, পতনোন্মুখ জমিদার কুলের অস্তমিত গরিমা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ এবং তার পাশাপাশি অন্ত্যজ মানুষ, বেদে-বাউরী-সাঁওতাল-রাজবংশীর দল।''[১৪]

বিমল করের গল্পে গ্রামীণ জীবনের চিত্র ফুটে ওঠেনি। লেখক গ্রামে থাকেননি, তাই কল্পনার আশ্রয়ে গ্রামের চিত্র অঙ্কন করেননি। কিন্তু তাঁর গল্পে পরিবেশ পটভূমিকায় বিহার ও বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ছবি লক্ষ্য করা যায়, যে ছবিতে মালভূম অঞ্চলের বন্ধুর প্রকৃতি, নদী, জঙ্গল লক্ষ্য করা যায়। 'মানবপুত্র', 'বুদবুদ', 'আঙুরলতা', 'সাদা কালো' প্রভৃতি গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের চরিত্র থাকলেও অধিকাংশ গল্পের চরিত্র মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তারাশঙ্করের গল্পে কাহিনীমূলকতা লক্ষিত হয়। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পে সুপরিকল্পিত, সাজানো একটি কাহিনী থাকে, এর মাধ্যমেই নিয়তির অনিবার্যতা, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, পুরুষকারের লড়াই, মানুষের বিত্ত ও অবস্থানগত আধিপত্য প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের প্রথম দিকের গল্পে কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে কাহিনী বা ঘটনার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' গল্পে জীবধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে। তারিণী মাঝি উত্তাল ঢেউয়ের সাথে লড়াই করতে করতে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে তার ভালবাসার মানুষ, স্ত্রী সুখীকে জলের তলায় গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এখানে চরম মুহূর্তে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার চেয়েও অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে নিজের জীবনোপভোগের বাসনা। 'অগ্রদানী' গল্পে প্রবৃত্তিরূপিণী নিয়তির জয় ঘোষিত হয়েছে। পূর্ণ চক্রবর্তী দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য শ্যামদাস বাবুর সদ্যজাত সন্তানের সাথে নিজের সন্তানের বদল ঘটিয়েছে। শ্যামদাসবাবুর স্ত্রীর সন্তান

প্রসব গৃহেই মারা যায়, অপর পক্ষে দারিদ্র্য থাকলেও পূর্ণ চক্রবর্তীর সংসারে সন্তানে অভাব নেই। শ্যামদাসবাবু পূর্ণ চক্রবর্তীকে প্রসব গৃহের দ্বারে ব্রাহ্মণ হিসেবে রাখেন এবং ঘোষণা করেন যদি এই সন্তান বেঁচে যায় তাহলে দশবিঘা জমি ও প্রতিদিন একথালা করে সিংহবাহিনীর প্রসাদ পাবে পূর্ণ চক্রবর্তী। যথারীতি মৃত সন্তান প্রসব করেন শ্যামদাসবাবুর স্ত্রী এবং পূর্ণ চক্রবর্তী নিজের সন্তানের সাথে সেই সন্তানের বদল ঘটিয়ে দেন। কিন্তু চৌদ্দ বছর পর সেই সন্তানের মৃত্যু ঘটলে তার পিণ্ড গ্রহণের জন্য ডাক পড়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর। তার মন হাহাকার করে ওঠে, প্রথমে অরাজি হলেও শেষ পর্যন্ত জমির লোভে ও দারিদ্র্য মোচনের অভিলাসে অসহায়ভাবে সম্মতি দেন। এই গল্পে নিয়তির নির্মম পরিহাস পূর্ণ চক্রবর্তীর উপর আঘাত হেনেছে।

'ডাইনি' গল্পে কুসংস্কারের বলি হয়েছে নিরপরাধ বৃদ্ধা। আবার 'সন্তান' গল্পে কদাকার সন্তানকে হত্যা করেছে তার পিতা। 'তিনশূন্য' গল্পে দরিদ্র, ভিক্ষুক ল্যালা কিশোরীর উপর বন্য যৌনতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এইসব গল্পে তারাশঙ্কর মানবের প্রবৃত্তি, সন্দেহপ্রবণতা, কুসংস্কারের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁর গল্পেও মৃত্যুভাবনা, জীবনের প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই প্রবণতা চারের দশক থেকেই তাঁর গল্পে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। 'বোবাকান্না', 'পৌষলক্ষ্মী', 'না', 'দেবতার ব্যাধি' প্রভৃতি গল্পে আধুনিক জীবনের নৈরাশ্য, আশাভঙ্গের বেদনা, সমকালীন পরিস্থিতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে উত্তরণের পথও তিনি খোঁজার চেষ্টা করেছেন মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষমাশীলতা, আশাবাদী মানসিকতা, অধ্যাত্মবাদী ভাবনার মাধ্যমে। 'না' গল্পে ব্রজরানি তার স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করে মানবিকবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে অতীত মহিমার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েও মুকুন্দ পালের মৃত্যুর মাধ্যমে কালের পরিবর্তনকে সমর্থন করেছেন লেখক এবং এর পাশাপাশি দেখা গেছে জরারূপী নিয়তির কাছে জীবনের পরাজয় ঘটেছে। এই গল্পে মন্বন্তরের প্রভাবও রয়েছে। 'বোবাকান্না', 'ইস্কাপন', 'মরামাটি' প্রভৃতি গল্পেও মন্বন্তরের ছবি লক্ষ্য করা যায়। আবার 'বিস্ফোরণ' গল্পে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শেষ কথা' গল্পে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, অনশন, কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু এই সমস্ত সমকালীন ঘটনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি' প্রভৃতি গল্পে সামন্ততান্ত্রিকতার বিলোপের মতো বাস্তবঘনিষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তারাশঙ্কর সাহিত্য রচনা করেছেন। সমকালের বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষের জীবন তাঁর গল্পে তাই

এত জীবন্তভাবে রূপ পেয়েছে। ''তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা, তাঁর জীবন চিন্তা, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ --সবই এই ব্যবধানের হেতুমূল। তিনি তো উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধির মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্যে এসে পৌঁছাননি : নৈরাশ্য তাঁর ছিল -- কিন্তু গ্রাম সমাজের সংস্কারে বিশ্বাসে পালিত তারাশঙ্কর নৈরাজ্যকে তখনও মেনে নিতে পারেন না। তাঁর দুঃখচেতনা প্রত্যক্ষ রাঢ় অভিজ্ঞতার ফল। অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন আধিব্যাধিতে বিড়ম্বিত পল্লীবাংলার ব্যাপক অবক্ষয়, আদিমতা আর হৃদয়াবেগে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের হৃদয়, জ্ঞান-অজ্ঞানকৃত নিরুপায় পাপ এবং তার উপর বিধাতার নির্মম দণ্ডাঘাত, আর পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত-- ''মানুষ নিজের কাছে কী অসহায়, সংসারে কী নিদারুণ বঞ্চনা, হৃদয় কি কঠোর ভাবে অপমানিত, দারিদ্র্য কী ভয়ঙ্কর, মৃত্যু কী ক্ষমাহীন, পাপের জন্য কী করাল বজ্র সমুদ্যত।' এক কথায় তারাশঙ্করের দুঃখবোধ ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত -- তার ব্যপ্তি যেমন বিরাট, তার উপলব্ধি তেমনি সুদুঃসহ।''[১৫]

বিমল করের বেশ কয়েকটি গল্পে সমকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মানবপুত্র' গল্পে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ছবি ফুটে উঠেছে। মানুষের দুর্বিষহ জীবনাকাঙ্ক্ষা, নারীর জীবনের অসহায়তা, লোভের বশবর্তী হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া --সব কিছুই গঙ্গামণি চরিত্রের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। 'ইঁদুর', 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন লেখক, এবং এর মাধ্যমে মানুষের অসহায় জীবনচিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বিমল করের অগ্রজ সাহিত্যিক, যাঁর রচনায় সমকালের ঘটনা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে মানবের অন্তর-জগতের রহস্যময়তা। কল্লোলের সমকালে তিনি সাহিত্য রচনা করলেও তিনি তাঁর যুক্তিবাধের সাথে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের জীবনদর্শনকে মেলাতে পারেন নি। ছেলেবেলা থেকেই 'কেন' শব্দটির পেছনে ঘুরে ঘুরে সাহিত্যের মধ্যেও খুঁজে পেতে চেয়েছেন সেই বিচারবোধ ও বাস্তব পরম্পরা। তিনি চেয়েছেন সেখানে ভাবুকতা যেমন থাকবে তেমনি থাকবে বাস্তবতা, প্রেম যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে তার সংহত দর্শন। তাই মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুললেন বাস্তব মানুষের প্রকৃত ছবি, যার মধ্যে অহেতুক কল্পনাপ্রবণতা নেই। ''আমি নিজে ভাবপ্রবণ, অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি।''[১৬] -- লেখক দাবি করেছেন, একারণেই নর-নারীর প্রেমের জটিল রূপ যা একান্ত ভাবেই বাস্তব তা

প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে তাই ভিখু ও পাঁচি ভিখারী হয়েও মানুষ, তাদেরও ক্ষুধা নিবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য জৈব ক্ষুধার আলোড়ন তাদেরকে ভিতর থেকে নাড়া দেয়। হৃদয়াশ্রিত প্রেমের পাশাপাশি দেহাশ্রিত প্রেম যে বাস্তব তার উল্লেখে কোন দ্বিধা নেই এই সব ছোটগল্প ও উপন্যাসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ধনী মানুষদের পাশাপাশি হঠাৎ অর্থলাভ করে কিছু মধ্যবিত্তের মনেও যে ভণ্ডামি, হিংসা, যৌনবিকৃতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা দেখা গিয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর গল্পগুলি। মানুষের মনোরাজ্যে হানা দিয়ে তিনি যেন প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের ছবিকে তাঁর ফটোগ্রাফিক নিপুণতায় খুঁজে পেয়েছেন। সর্পিল, মহাকালের জটার জট, কুষ্ঠরোগীর বউ, চুরি, সরীসৃপ প্রভৃতি গল্পে নর-নারীর মগ্নচৈতন্য থেকে উদ্ভুত মানসিক বিকৃতির আভাস তার গল্পগুলিকে নতুনত্ব দিয়েছে।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে স্ত্রী নিভার অনুরোধ উপেক্ষা করেও নীলমণি প্রবল বৃষ্টিতে সংসারের সদস্যদের নিয়ে নিরাপত্তার জন্য সরকারদের বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করতে যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান বলি দিয়ে সাহায্য কামনা করেছে সরকারদের কাছে। এই অসহায় জীবনে তার মনে হয়েছে, ''জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমের সময় দুঃস্বপ্নে।''[১৭] নীলমণি এই পরাজিত জীবনে আত্মহত্যার পিছনে কোন অযৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি। দারিদ্র্য-জরা-ব্যাধির মধ্য দিয়ে নৈরাশ্যবোধের শেষ সীমায় সে পৌঁছে গেছে। যেখানে মনে হয় না-- 'জীবন অমূল্য'। 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে নারীর অপ্রাপ্তির বেদনা তার অশ্রুজলে সমুদ্রের নোনতা স্বাদ এনে দেয়। 'আপিম' গল্পে দুঃখ, যন্ত্রণা ভোলার জন্য নেশার প্রবৃত্তি মানুষের কাছে নতুনত্বের স্বাদ বহন করে আনে। আবার 'ফাঁসি' গল্পে লক্ষ্য করা যায় লোকনিন্দা ও জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে চরিত্রটি। এই গল্পে গণপতি অভিযুক্ত আসামী। তার বিরুদ্ধে নরহত্যার মতো অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন পর বিচারে সে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে ঘরে ফিরে এলে তার স্ত্রী রমার মনে সংশয় থেকে যায়। সে স্বামীকে প্রস্তাব দেয় চেনা-জগৎ থেকে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধার জন্য। কিন্তু গণপতি এই প্রস্তাবের পিছনে ভীরুতার প্রকাশ লক্ষ্য করে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়। বাইরের লোকের বিদ্রূপাত্মক আলোচনার প্রতি লজ্জাবোধ এবং স্বামীকে ক্ষমা না করতে পারার দুর্বলতা তার মনে জাগিয়ে তুলেছে আত্মহত্যার ইচ্ছা। সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে

তার স্বামীর প্রতি বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করেছে। খুনের আসামী স্বামীর সাথে পরিচিত জগতে একই ছাদের তলায় থাকতে না চাওয়ার প্রতিবাদে তার এই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছে।

বিমল করের 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গ তার পূর্বতন স্ত্রীর ফিরে আসার পর আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের পরিণতি ঘটিয়েছে। পায়রা পৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে তার মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছে হেমাঙ্গের কাছে। তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হেমাঙ্গ নিভৃতে কাঁচের শিশির ভাঙা অংশ দিয়ে নিজের গলার নলি কেটে এই জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনেছে। রমা এবং হেমাঙ্গের পরিস্থিতি ও ভাবনার বৈচিত্র্য থাকলেও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দুটি মানুষকে আবিষ্কার করা যায় এই দুটি গল্পে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা', 'নেড়ী', 'আজ কাল পরশুর গল্প' প্রভৃতি গল্পে মন্বন্তর-বিধ্বস্ত, যুদ্ধ পরবর্তী সমাজ জীবনের দুঃসহ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর্থসামাজিক জীবনের ঘোর অনিশ্চয়তা মানুষের নীতিচেতনা, মূল্যবোধকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে। নারীর প্রতি ষড়যন্ত্র, নারী ব্যবসার কদর্য রূপ এই গল্পগুলির বিষয়। 'নমুনা' গল্পে কালাচাঁদ শৈলকে দেহব্যবসার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে বিয়ে করে । শৈলর বাবা কেদার চক্রবর্তী মেয়েকে পাত্রস্থ করার দায়ে এবং দারিদ্র্যের কারণে জেনে শুনেই এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছে। বিয়ের পর সুপ্ত ভালবাসার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে কালাচাঁদ শৈলকে দেহব্যবসায় নামাতে রাজি হয় না, তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ব্যবসায় তার সহযোগিনী মন্দোদরী যখন চাল ব্যবসায়ী গজেনের কাছ থেকে পাওয়া নোটের একটা বান্ডিল কালাচাঁদের হাতে বাড়িয়ে দেয়, কালাচাঁদ তখন সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। খরিদ্দারের পছন্দ অনুযায়ী গ্রামের কুমারী মেয়ে তুলে দিতে পেরেছে বলে স্বস্তি অনুভব করে। 'আজ কাল পরশুর গল্প'তে দেখা যায় ঘনশ্যাম, গোকুলের মত সমাজপতিরা নারী-ব্যবসার জন্য গ্রামের মেয়েদের বেশ্যাবাড়িতে চালান করে। গিরিবালা তাদের শিকার। আবার স্বামী রামপদর নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণে ও সন্তানের মৃত্যুতে অসহায় দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, অবস্থায় মুক্তা নিজের শরীর বেচে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। এর পর রামপদ ফিরে আসে এবং সমাজসেবিকার হাত ধরে মুক্তা কিংবা গিরিবালারা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ফিরতে চাইলে ঘনশ্যামের মত সমাজপতিরাই বিরুদ্ধাচরণ করে, অবশেষে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে নির্যাতিত এই মেয়েরা। 'নেড়ী' গল্পেও হৃদয়পণ্ডিত নারীপাচার কাজে নিযুক্ত

হয়েছে। তার অর্থ দিয়ে নিজেদের সুখ শান্তিকে সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়ায় মনের মধ্যে মূল্যবোধের শূন্যতাকে দ্যোতিত করে।

বিমল করের 'আঙুরলতা' গল্পে নন্দ এমনিভাবে আঙুরলতাকে পৌঁছে দিয়েছিল বেশ্যালয়ে। আঙুরের জীবনের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ এই নন্দের হৃদয়হীনতার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঙুরলতা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে না পারলেও, নন্দের মৃত্যুর পর তার পারলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামে সে ব্রতী হয়েছিল, সেখানে মানবিকতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে।

অকারণ যৌনতা বা মানস বিকৃতি নয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চূড়ান্ত মানসিক অস্থিরতা ও জটিলতা যাকে কল্পনার মুখোশে লুকিয়ে রাখা যায় না, যার প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত আদিম স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া যায় লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায় তাই দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু মানুষের নৈরাশ্যের চিত্র দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, তার মূলানুসন্ধানেও তৎপর হয়েছেন। অর্থনৈতিক অসাম্যে ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ -- যখন গভীর নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হয়ে যায় তখনই তার মধ্যে অবচেতনের ক্রিয়া শুরু হয়। এই স্থান থেকে সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সাম্যবাদী ভাবনার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। তবু তার প্রভাব সাহিত্যে তেমন ভাবে প্রতিফলিত না হলেও জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে মানুষের জীবনকে ও চরিত্রকে তিনি যেমনভাবে ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করেছেন তা পরবর্তীকালেও বহুক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে।

বিমল করের গল্পে মানুষের মগ্নচৈতন্যের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। আত্মমগ্নতা, নারী-পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিশ্বাসবোধের অবক্ষয়, আবার তাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মানসিক জটিলতা, যৌন সমস্যা, সমকাল চেতনা -- এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিমল করের গল্পেও প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন সাহিত্যের গতি প্রকৃতির নিরিখে।

সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০) বিমল করের সমকালীন গল্প লেখক। কল্লোল পরবর্তী কালের সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য ও সমাজ চিত্র তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন চিত্র, মানুষের জীবনের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রমজীবী মানুষ, নিপীড়িত নারীসমাজ তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন। তাঁর কয়েকটি রচনায় গান্ধীবাদের প্রতি দুর্বলতা ও

কমিউনিস্টদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হলেও, পরবর্তী কালে সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়নি। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি যেমন তাঁর বিশ্বাস ছিল, তেমনি সমকালীন পরিস্থিতিতে বিশেষত পরিবার জীবনের ভাঙন, দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কলুষতা তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে চলা সমাজ ও মানুষের নানা বৈচিত্র্য তিনি ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গল্পে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার চিত্র যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনি শেষ জীবনে শূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আত্ম গবেষণার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন; সন্ধান করেছেন প্রকৃতি ও পশু জগতের সারল্যের সঙ্গে মানব জীবনের সম্বন্ধসূত্র। ''ব্যক্তি জীবনই তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয় তাই ব্যক্তি-জীবনের নেপথ্যে তার চেতনাজগৎ এবং সেই জগতে নানা ঘটনার প্রক্ষেপ ও তার মূল্যায়ন এবং ব্যক্তি মানুষের চেতনালোকে মূল্যবোধের উদ্ভাসন, মূল্যবোধের রূপান্তর, মূল্যবোধের সংকট, মূল্যবোধের উত্তরণ প্রভৃতি পর্যায় প্রতিভাত হয়।''[১৮]

সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়ে ধনিয়া দারিদ্র্যের কারণে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে অভিজাত ঘরের সন্তানদের বাঁচিয়েছে, এবং নিজের দেহব্যবসার ফলে লভ্য সন্তানকে ফেলে এসেছে মিশন জেনানা হাসপাতালে। কিন্তু তার এই স্বার্থত্যাগের দান সভ্য সমাজ মনে রাখেনি। তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। সমাজের চেহারাও ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। ''বছরের পর বছর ঘুরে গেছে.. পাঁচ সাত দশ বারো ষোল আঠারো -- বছরের পর বছর ভেসে গেছে ধনিয়া প্রায় চল্লিশ বছরে পা দিল।''[১৯] নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি নতুন টাউনকে বাড়াতে চেয়েছে, যেখানে ধনিয়ার স্থান হয়েছে পতিতালয়ে। সুস্থভাবে জীবনের আশ্রয় লাভ করতে পারেনি ধনিয়া, সমাজই তাকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে।

বিমল করের 'বুদবুদ' গল্পে স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত পড়া বেলা মনডিয়াল জীবনে প্রত্যাশা করেছিল সভ্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশী সৈন্যরা তার জীবনে ধর্ষণের মাধ্যমে যে অদৃশ্য কলঙ্ক-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, তার জেরেই সে ঠাঁই পেলনা ভদ্রমানুষের সংসারে। পতিতাবৃত্তির মাঝে কয়েকটি মাস পঙ্কজ বোসের মতো ভদ্র লোকের আনুকূল্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু যখনই পঙ্কজ বোস বেলার অনালোকিত জীবন কাহিনী শুনলেন তারপর তার

প্রতি আর উদারতা প্রশ্রয় পেল না। বেলা জীবনের শেষে উন্মাদের মত দিন কাটিয়েছিল। ভদ্র সমাজ স্বপ্নদর্শী এই মানুষদের জীবনকে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। নারী-জীবনের অসহায়তা সুবোধ ঘোষের গল্পের মত বিমল করের গল্পেও প্রকাশ পেয়েছে।

বিমল কর তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অগ্রজ সুবোধ ঘোষের প্রভাব মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''সুবোধদা প্রবাসী বাঙালি, ওঁর কৈশোর-যৌবনকাল অনেকটা বিহারেই কেটেছে, আর আমিও তো মোটামুটি ভাবে বিহারে মানুষ, আমাদের পরিবেশটা একই রকমের ছিল। শুধু পরিবেশ নয়, বাঙলার বাইরে বাঙালিদের যে ধরণের সামাজিক কাঠামো, আচার আচরণ, বাঙালি-অবাঙালি সমাজের মিশ্র পরিবেশ ইত্যাদি থাকে, তারও একটা মিল আমাদের দুজনের লেখায়। আর তা ছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তীকালে যদি গল্পকার সুবোধ ঘোষের কথা ভাবা যায়,... তিনি এমন একজন শক্তিমান ও প্রভাববিস্তারী লেখক যে, নতুন গল্পকারদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুব মুশকিল ছিল। কাজেই, আমি মনে করি না, এই প্রভাবে আমার কোনও লজ্জা আছে।''[২০]

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে দেখানো হয়েছে নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্যাতিত জীবনের কোন পরিবর্তন হয় না। অঞ্জনগড়ের রাজার কাছে কুর্মিরা ন্যায্য পাওনা দাবি করে, বিনা পারিশ্রমিকে বেগার পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। তাদের কাছে আর্থিক সুযোগ নিয়ে আসে বণিকতন্ত্র। রাজার লাঠির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরে কুর্মিরা কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আদর্শবাদী তরুণ দরবারের ল-এজেন্ট মিঃ মুখার্জী মাটির নীচে অভ্র ও অ্যাসবেস্টসের খনি আবিষ্কার করার পর বণিকতন্ত্রের উন্মাদনা শুরু হয়। কুর্মিরা টাকার বিনিময়ে কাজের সুযোগ পায়। তারা ধীরে ধীরে বণিকতন্ত্রের শোষণের দ্বারা তাদের হাতের পুতুলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মরিশাস থেকে ফিরে আসা দুলাল মাহাতো এই শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠে। রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব এই সময় হঠাৎ থেমে যায়। কারণ চৌদ্দ নম্বর পিট ধসে গিয়ে নব্বই জন কুলি-কামিন চাপা পড়ে। এতে যেমন সিন্ডিকেট কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তেমনি ফৌজের গুলিতে বাইশ জন শ্রমিক গাছ কাটার অপরাধে মারা যাওয়ায় মহারাজাও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অবশেষে মিঃ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে সিন্ডিকেট ও রাজার মধ্যে আঁতাত তৈরি হয়েছে এবং শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতো খুন হয়েছে। দুলাল মাহাতো ও কুর্মিরা শাসনযন্ত্রের শিকার, আর সিন্ডিকেট বা রাজা

শোষণকারী হয়ে উঠেছে এখানে। মিঃ মুখার্জী অবশেষে মূল্যবোধ হারিয়ে বিদ্রোহের পথ ছেড়ে শাসকতন্ত্রের সদস্য হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, শ্রমিক শ্রেণীর অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে না পারা এবং তার ফলে তাদের জীবনে মৃত্যুর করাল গ্রাস নেমে আসার ছবি এখানে বর্ণিত।

বিমল করের 'যক্ষ' গল্পেও শ্রমিকদের জীবনের অসহায়তা বর্ণিত হয়েছে। চৌবেরডি সেক্‌শনের রেলপথ নির্মাণের জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানোর কাজ চলেছে। মিঃ গিবসনের অফিসে কর্মরত ভরত চৌধুরী এই কাজে নিযুক্ত হলেও বিদেশী শাসনযন্ত্রের হাত থেকে আর্যাবর্তের মহিমাকে সে খুন হতে দিতে চায় না। তবুও মনের দুঃখে সেই কাজেই তাকে ব্রতী হতে হয়। এই অঞ্চলের প্রায় সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের কাজের সুযোগ দেওয়ায় মাধো রায়ের গাছ কাটার জন্য পুরুষ শ্রমিকদের টান পড়ে। মাধো রায় তার স্বাজাত্যবোধকে প্রকাশ করায় ভরত চৌধুরীর যন্ত্রণাদগ্ধ উক্তি প্রকাশিত হয়, ''মাধোজি, এ দেশ তোমার নয় শুধু আমারও! কিন্তু এখন না তোমার না আমার।''[২১] মাধো রায় কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের নিজের দিকে টানলেও একটা সময় বন্যাবিধ্বস্ত মানুষেরা নিরাপত্তার স্বার্থে কোম্পানীর হয়েই কাজ করতে শুরু করে, মাধো রায় হয়ে ওঠে তাদের নেতা। ভরত চৌধুরী ফ্যাভরে কোম্পানীর কাজ শ্রমিকের অভাবে থেমে যাওয়ায় যে মানসিক আনন্দ পেয়েছিল, আবার শ্রমিকেরা ফিরে আসায় তার মধ্যে যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ক্রমাগত ঘটে চলা দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিকদের জীবনের পরিসমাপ্তি তার মনে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এই পথে ধ্বংসের উন্মাদনায় সে একদিন নিজেকেই শেষ করে ফেলল। --এই গল্পে ভরত চৌধুরী আর্যাবর্তের কালচারকে বাঁচাতে চেয়েছে। সে ভেবেছে, ''একটা মৃত সভ্যতাকে আর বাঁচানো যায় না; তবে চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত এখনও ক্ষীণ ধারায় যেটুকু টিকে আছে, তাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যায়।''[২২] অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, আর্যাবর্তের মহিমায় আচ্ছন্ন অথচ হতাশাগ্রস্ত ভরত চৌধুরী তার জীবনের মাধ্যমে যেন যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনে গেছে।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থানও শ্রেণীগত অবস্থানই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তাকে শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে --এই বিষয়ের উপর গড়ে উঠেছে সুবোধ ঘোষের 'তিন অধ্যায়' গল্পটি। ভবানী, বারীণ, সতু, শশীর মত শিক্ষিত কর্মহীন যুবকেরা কিংবা ভবানীর কাকা, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের মত প্রৌঢ় মানুষেরা অহি, বন্দনা, কিংবা পুলিন বাবুর শ্রমভিত্তিক

জীবনের উপর তাদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার পদ থেকে সর্দার স্ক্যাভেন্জার পদের পরিবর্তনে অহি সুখী হয় না যেমন, তেমনি সমাজও তাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। বন্দনা হাসপাতালের নার্স হওয়ায় তার সামাজিক প্রতিপত্তি কমে। আর পুলিন বাঁড়ুজ্যে জুতোর দোকান করায় 'পুলিন চামার'এ পরিণত হয়। পুলিন বাবু প্রথমে দোকান ও মুচিদের বসার জায়গায় মাঝখানে একটা পর্দা ঝোলালেও পরে খুলে ফেলেছেন। ভদ্র সমাজের মানুষদের কাছে এঁদের বৃত্তি নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। তারা মনে করেছে ''সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য করে সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়! এঁকে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া।''[২৩] এই কারণেই ফোর্থক্লাস পর্যন্ত একসাথে পড়া অহিকে বন্ধুত্বের মর্যাদায় বাঁধতে চায় না ভবানীরা। বন্দনার মত মেয়েদের কুৎসা গায় পঞ্চমুখে। শুধু তাই নয়, তাদের একাধিক বিয়ের সম্বন্ধ নিজেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভেঙে দিয়ে মনে করে সমাজ শোধনের কাজে তারা ব্রতী হতে পেরেছে। কিন্তু অহি ও বন্দনার বিয়ে যখন কোন ভাবেই তারা ভাঙতে পারেনি, তখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাকেই সাফল্য মন্ডিত করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত যুবকদের হৃদয়ের এই অন্তঃসারশূন্যতা, কদর্য মানসিকতা এই গল্পের প্রধান অবলম্বন।

বিমল করের 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পে তিনু, বীরু, পাঁচু-রা তাদের বাল্যসঙ্গিনী জিনির কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে না পারলেও তাদের সন্দেহপ্রবণতা, লোভী মানসিকতার দ্বারা জিনির জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে সিনেমা হলের চাকরি থেকে জিনিকে বরখাস্ত করেছে। জিনির প্রেমিক মনে করে সুখেনকে আক্রমণ করেছে এমন কি পরবর্তীকালে বাল্যবন্ধু আলুওয়ালা নন্দকে মেরে জিনির হাতে সেবা-শুশ্রূষার জন্য দিয়ে এসেছে। আলুওয়ালা বলে নন্দকে যেমন তারা বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয় নি, তেমনি জিনিকেও সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করেছে। অবশেষে তাদের বিয়েতে সাক্ষী হতে গিয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে পালিয়ে এসেও সকলকে লুকিয়ে জিনি এবং নন্দর পরিণতি দেখার জন্য চুপিসারে হাজির হয়েছে। 'তিন অধ্যায়' ও 'বরফ সাহেবের মেয়ে' দুটি গল্পেও আর্থিক ও বৃত্তিগত প্রভেদের কারণে নির্যাতিত হতে হয়েছে নিম্নশ্রেণীদের। 'বরফ সাহেবের মেয়ে'তে যুক্ত হয়েছে ধর্ম বা জাতিগত প্রভেদ।

'চোখ গেল', 'ঈশ্বরিক', 'মানশুক্লা' প্রভৃতি গল্পে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। 'চোখ গেল' গল্পে অপরাজিতা আত্মকেন্দ্রিকতা, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ থেকে হিরণ্ময়ের অন্ধত্বকে বড় করে দেখে তার প্রেমিক সত্তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংশুকের কাছে ফিরে যাবার বাসনা পোষণ করেছে, কিন্তু অবশেষে হিরণ্ময়ের অনুভব শক্তির তীব্রতা, ভালবাসার মত সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। 'ঐশ্বরিক' গল্পে খুনি আসামীও সাধারণ মানুষের দ্বারা তার প্রতি প্রদত্ত সম্মানের প্রতি অন্যায্য বিচার করেনি। অসুস্থ শিশুর জন্য মঙ্গল কামনায় তার চোখেও এসে গেছে মানবিকতায় আর্দ্র অশ্রু। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসেও যে আদর্শবাদী ভাবনা, মূল্যবোধের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল সেই আদর্শ বিমল করের রচনায় যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বমূলকতা বিমল কর যে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুটা তাঁর কাছ থেকেও লাভ করেছিলেন, তাও উল্লেখ করা যায়।

বিমল করের সমকালীন গল্পকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী'র (১৯১২-১৯৮৩) নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর সময়কালে, বিশেষত চল্লিশের দশক থেকে গল্প রচনার মাধ্যমে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও সমাজের প্রতি ভাবনাকে প্রকাশ করেছিলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। খেটে খাওয়া অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষও তাঁর গল্পে দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি তাঁর গল্পে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। ''প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারেন, তার প্রধান কারণ লেখকের ইন্দ্রিয় সচেতনতা। তিনি আজীবন প্রকৃতির রূপ রস শব্দ ও গন্ধের মধ্যে আদ্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন।''[২৪] বিমল কর শহর কিংবা মফঃস্বল জীবনের চিত্রকর হলেও তাঁর গল্পে প্রকৃতিবর্ণনা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি মানব জীবনের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতীকের মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তৎকালীন পরিবেশকে গভীর ইঙ্গিতময়তায় আচ্ছন্ন করেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গ্রামের পাশাপাশি শহরের ছবিও এঁকেছেন। এবং অধিকাংশ গল্পেই তাঁর নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ''তিনি নাগরিক জীবনের কথাকার। নগর-জীবনে ধনী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর পার্থক্যটা বড় করেই চোখে পড়ে। আর এই শ্রেণী বৈষম্য একটা বড় সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আঘাতের ফলে বড় হয়ে দেখা দেয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর লেখক জীবনের প্রথম থেকেই সেই শ্রেণীর বিষম

অবস্থার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছিলেন।''[২৫] --তাঁর ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও তাঁর গল্পে মানব মনের অন্তর্জগতের ছবি আঁকার প্রয়াস লক্ষিত হয়, যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্পকারদের কাছে অনুকরণীয় করে তুলেছিল। ''জ্যোতিরিন্দ্র তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক নন। তার চেয়ে কিছু বেশি। আসলে তিনি অন্তর্লোক উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে।''[২৬]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শালিক কি চড়ুই', 'মঙ্গল গ্রহ' প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি প্রতীকধর্মিতায় উদ্ভাসিত। এর সাথে রয়েছে মনস্তত্ত্বের গূঢ় জটিলতা। 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে সাধারণ কেরাণি তারাপদর সঙ্গে অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে শানুর বিয়ে হয়েছিল। বিত্তগত পার্থক্যের কারণে তারাপদ শানুকে হাবেভাবে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেয়। তারা দাম্পত্য জীবনে সুখী হলেও অফিসের বন্ধুরা তারাপদর মনে নানাভাবে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায়। একদিন শানুর দ্বিপ্রাহরিক নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য তারাপদ অফিস থেকে ফিরে আসে। মনে মনে কল্পনা করে শানু হয়তো তার বাবার বাড়ির মতো এখানেও চড়ুইদের নিয়ে দুপুর বেলাটা কাটাচ্ছে। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার সময় দেখতে পায় শানুর বিবাহপূর্ব জীবনের প্রেমিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চড়ুই নেই, একটা শালিক দূরে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারাপদ শানুকে যখন শালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন শানু উত্তর দিয়েছে, 'সবাই ফিরে যায় রোজ'[২৭] --এই সবাই'র মধ্যে রয়েছে শানুর প্রণয়প্রার্থীও। কিন্তু বাইরের মানুষের আসা এবং ফিরে যাওয়া শানুর মনে কোন প্রভাব ফেলে না। সে স্বামীর সংসারে তার হৃদয়ের প্রদীপটিকে অম্লানভাবে জ্বালিয়ে রাখে। পৈত্রিক সম্পত্তি বা বিত্তের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যের হানি ঘটায় না। কিন্তু তারাপদর বন্ধু মহলে যে সন্দেহের বীজ রয়েছে তা সম্পূর্ণ মুছে যায় না। তবুও এই গল্পে দাম্পত্যজীবনের সুন্দর শোভন ছবি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কাঠ পিঁপড়ে', 'চন্দ্রমল্লিকা', 'পতঙ্গ', 'গিরগিটি' প্রভৃতি গল্পে প্রতীকের ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি গল্পগুলির মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

'পতঙ্গ' গল্পে লেখক নাগরিক জীবনে নারীর অধৈর্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও যৌনচেতনাকে প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তীর স্ত্রী রূপা দাম্পত্য জীবনের শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করার প্রত্যাশায় মনে ঠাঁই দেয় বিকৃত যৌনতার সম্পর্ককে। একাধিক পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটানোর প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে পলাশ যখন জানতে পেরেছে রূপা শুধু তার ভোগ্যা

নয়, সে বহুভোগ্যা, তখন সে তাকে হত্যা করে। এই হত্যার পিছনে তার সুকুমার প্রেমবোধে কলঙ্কচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার বাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাম্পত্য জীবনের এই বিকারগ্রস্ত যৌন-মানসিকতা লেখক সমর্থন করতে পারেননি বলেই পলাশের হাতে তাকে খুন করিয়েছেন। নাগরিক জীবনের অন্তঃসার শূন্যতার ছবির পাশাপাশি এই গল্পে পলাশের চোখে নারীর সৌন্দর্যময় রূপের বর্ণনাও প্রকাশ পেয়েছে।

'গিরগিটি' গল্পেও নারীদেহের সৌন্দর্যের পাশাপাশি জাগতিক সৌন্দর্যবোধের ছবি লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ ভুবন মায়ার স্নানরত অবস্থায় তার দেহ সৌন্দর্যকে লুকিয়ে লুকিয়ে উপভোগ করে। ডালিম গাছের সাথে সে মিলিয়ে ফেলে মায়ার দেহবল্লরীর শোভা। আবার মায়াও কুয়োতলায় প্রজাপতি, গাছ, স্যাওলার মধ্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকে উপভোগ করে। প্রণব এবং মায়ার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে ফাটল রয়েছে। মায়া প্রণবের দেখার চোখও আলাদা, তাই মায়া প্রণবকে জাগতিক সৌন্দর্য দেখার আমন্ত্রণ জানায়নি। আবার নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্পর্কে সে নিশ্চিত হলেও প্রণবের চোখে তা ধরা পড়েনি বলে হতাশা প্রকাশ করে। ভুবনের দৃষ্টিতে এই গল্পে লেখক কামনা বা যৌনতার সম্পর্ক যুক্ত করেননি। আবার মায়ার মধ্যে যে মূল্যবোধের সন্ধান করেছেন তাও ব্যভিচারে আক্রান্ত নয়। নারীর রূপ প্রকৃতির রূপের সমধর্মী। নিরাসক্ত আর্টিস্টের চোখে তা দেখায় কোন অন্যায় বা পাপ নেই --এই বক্তব্য এখানে প্রতিষ্ঠিত।

বিমল করের 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'পলাশ', 'সুধাময়' প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতিচেতনা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। 'শীতের মাঠ' গল্পের প্রকৃতি নবেন্দুর মনের নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তিময়তার সাথে একাত্ম। 'গগনের অসুখ' গল্পেও প্রকৃতি চরিত্রের মানসদর্পণ হয়ে উঠেছে। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর মনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানস প্রবণতার সাথে অশ্বত্থ গাছ শিশু সন্তানের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের মধ্য দিয়ে মানবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির প্রচেষ্টা 'অশ্বত্থ' গল্পটিকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

সমাজের কাছে সত্যভাষণের দায়বদ্ধতা নিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিমল করের সমকালীন এই গল্পকারের রচনায়ও ফুটে উঠেছে নাগরিক জীবনে সমাজ ও ব্যক্তিমনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা, জীবনের প্রতি ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা, এবং মৃত্যুচিন্তা। যদিও তিনি বলেছিলেন, ''আমি লিখিয়ে হয়েছি স্রেফ এই কারণে যে, আর কিছু হওয়া (ভালো পড়ুয়া, সাব-ডেপুটি বা সাব জজ) আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে।

লেখা মানে গল্প লেখা, আসলে একটা আনস্কিল্ড লেবার (সেই লেবার যা লাভ-এর নয় বলেই বুঝি নেভার লস্ট) যার খুশি সেই বুঝি এই রসুন চৌকিতে এসে পোঁ ধরতে পারে!''[২৮] --তবুও তাঁর গল্পে যে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা আছে, মনস্তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণ রয়েছে তা তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বকীয়তা দিয়েছে। ''তীক্ষ্ণমুখ লেখনীকে সন্তোষ কুমার ব্যবহার করেছেন সমাজের ও ব্যক্তির ব্যবচ্ছেদে ও নির্মম উদ্‌ঘাটনে। মানব জীবনের প্রতি তাঁর মমতা আছে, ঈষৎ বেদনা ও চাপা বিদ্রূপ-মেশানো সে মমতা। তাঁর গল্পে জীবনাসক্তি মৃত্যুচেতনায় বিধৃত। সে মৃত্যু কখনো মোহের অবসান, কখনো প্রতীক্ষার সমাপ্তি, কখনো বা আত্মাবলুপ্তির আশঙ্কা।''[২৯]

সন্তোষ কুমার ঘোষের বেশ কিছু গল্পে মানব সম্পর্ক ও দাম্পত্য সম্পর্কের অসারত্ব লক্ষ্য করা যায়। 'যাদুঘর', 'গিল্টি', 'পারাবত', 'অমিত্রাক্ষর', 'সমান্তর' প্রভৃতি গল্পে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'যাদুঘর' গল্পের নায়িকা সুরমা জগদিন্দুর হাত ধরে পালিয়ে গিয়ে 'অন্নপূর্ণা আশ্রম' নামে বাঙালি হোটেলে কাজের মেয়ে হিসেবে আত্মনিযুক্ত হয়। পালিয়ে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই জগদিন্দুর প্রতি তার মোহ কেটে যায় এবং সে বিষ খাইয়ে জগদিন্দুকে মেরে ফেলতে চায়। বিষের মাত্রা কম থাকায় জগদিন্দু বেঁচে যাওয়ার পর দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে খাদ্যের বিষক্রিয়া পরীক্ষার জন্য আগে পোষা বিড়ালকে খেতে দিয়ে পরে সে খাবার গ্রহণ করে। শুধু তাই নয় হোটেলের খরিদ্দারদের কাছে সুরমাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করে। একই ছাদের তলায় থাকলেও দুটি নারী-পুরুষের মানসিকতায় তীব্র দূরত্ব বজায় থাকে। মূল্যবোধহীনতার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে প্রেমজ সম্পর্কের মানুষকে অর্থপার্জনের জন্য দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে। সুরমারও মনে হয়েছে, 'পুরুষ মানুষ, অত্যন্ত স্থূল, দৈহিক অর্থে। নইলে জগদিন্দুর আছে কী। না শিক্ষা, না রুচি, না চরিত্র।'[৩০]

'অমিত্রাক্ষর' দাম্পত্য সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প। সীতার মায়ের কূটনৈতিক চালে সীতা ও শিশিরেন্দুর বিয়ে হয়েছিল। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও তারা কেউ বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একদিন শিশিরেন্দুকে সীতার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকলজ্জা ও কলঙ্কের মিথ্যা জালে জড়িয়ে দিয়ে তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল সীতার মা। বিয়ে হয়ে গেলেও হীনম্মন্যতার কারণে সীতা নিজেকে শিশিরেন্দুর সাথে মেলাতে পেরেছিল না। ওদের দাম্পত্য সম্পর্কে হিম শীতলতা ও সন্দেহপ্রবণতা বাসা বাঁধতে থাকে।

বিমল করের 'জানোয়ার' গল্পে দাম্পত্য প্রেমের ভাঙন তীব্রভাবে লক্ষিত হয়েছে। সুধীবন্ধু সোম ও তার স্ত্রী অতসীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। সুধীবন্ধু চাকরিতে উন্নতির নেশায় সহকর্মীদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেনি। অপর দিকে ঘরের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেতে চায় অতসী। কিন্তু পার্শ্ববর্তী যে কোন বাড়িতে গেলেই তারা সকলে অতসীকেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সকলে তাকে সুধীবন্ধুর স্পাই বলে ভাবে। স্বামীর অসামাজিক মনোবৃত্তি, সকলকে উপেক্ষা করার মানসিকতা সহ্য করতে পারেনা অতসী। স্বামীর কথা মতো বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে গিয়ে ক্রমশ দেহ মন সব দিক থেকেই নিজেকে সুধীবন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন, তীব্র অসন্তোষ, মনের অসহায়তা বোধ এই সকল গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তোষ কুমার ঘোষের কিছু রূপক গল্প পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে লেখক জীবন জিজ্ঞাসার নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অলীক পৌত্তলিক' গল্পে অলীকাসুর অসুখের হাত থেকে বাঁচার জন্য অমৃতের সন্ধান করেছে। একসময় মায়াময়ী এক নারীকে দেখে তার মনে শিল্পীসত্তা জেগে ওঠে। সেই নারী--দেবীকার মূর্তি বানায় সে, কিন্তু তার সেই নারী সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটলে তার বানানো মূর্তিও ভেঙে যায়। সে সেই ভাঙা মূর্তিটিই তুলে দেয় দেবীকার হাতে। অলীকাসুরের মাধ্যমে লেখক অতৃপ্ত, অসুখী মানুষের মনের গভীরে জন্ম নেওয়া প্রশ্ন ও বাইরের বাস্তবের অমিল দেখিয়ে মানুষেরই ভেঙে পড়া ছবি রূপকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শবানুগমন' গল্পেও মনের নিভৃতে মৃত মানুষকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটিকে বাহ্যিক শববহনের নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দ্যোতিত করেছেন লেখক।

বিমল কর 'উপাখ্যান মালা'র পাঁচটি গল্পের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের নানা প্রবৃত্তির অন্ধকারকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। সন্তোষ কুমার ঘোষের বেশ কিছু গল্পে মৃত্যুবোধে আক্রান্ত মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। 'মুখোশ', 'মানুষ', 'ভুল স্টেশন', 'শূন্যযান', 'নিহতের নাম' প্রভৃতি গল্পে আত্মিক মৃত্যুকে অতিক্রম করেও শুভবোধে আচ্ছন্ন হওয়ার প্রবৃত্তি, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে। 'শূন্যযান' গল্পে দুটি চরিত্র, লোকনাথ ও অনিতা শূন্যযানের মাধ্যমে অন্যলোকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। এই লোকে যাওয়ার জন্য পার্থিব জগতের ভালবাসা, কামনা-বাসনা, মোহ সব কিছু পরিত্যাগ করে তাদের যেতে হবে। লোকনাথ বুঝতে পারে 'যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ'[৩১] সেখানেই

ফিরে যাওয়া উচিত। অন্যলোকে সেই জীবনের স্বাদ নেই। স্বাদহীনতা নিয়ে জীবনে বাঁচা সম্ভব নয়। পার্থিব জগতের দুঃখ দুর্দশা সব কিছুর ভিতর দিয়েই মহত্তর সুখের অনুভূতি লাভ করা যায়।

বিমল করের 'শূন্য' গল্পে নিশীথ, মৈত্র সাহেবের কাছে জীবনের কয়েক বছরের দুঃখময় স্মৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। একটি দিনের সংজ্ঞাহীন ঘুমের পর তার মনে হয়েছিল মৃত্যুপ্রতিম এই ঘুম আর দুঃখময় স্মৃতি সমার্থক নয়। দুঃখ নিয়েই সে অবশেষে সুন্দর জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। আধুনিক জীবনের শূন্যতা, হতাশা, বিষণ্নতা, মৃত্যুবোধ, একাকিত্ব সম্পর্কের ক্রমভঙ্গুরতা সন্তোষকুমার ঘোষের মত বিমল করেরও গল্পের বৈশিষ্ট্য। বিমল করও তাঁর মত শুভবোধকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। জীবনের অন্বেষণের মাধ্যমে জীবনকেই মূল্যবান করে তুলেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) সাথে বিমল করের গল্পের বিশেষ মিল হল, এঁরা সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতা, পাপ, অন্যায়, ভোগসর্বস্বতা, স্বার্থপরতার রূপ দেখেছেন, এবং তার ছবি গল্পে প্রকাশও করেছেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, সমাজ ও জীবনের নেতিবাদিতার মধ্যেও শুভবোধ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়গত প্রেম, মূল্যবোধ এর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র চারের দশকের লেখক হলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনে নির্মম হয়ে ওঠেননি। স্বপ্ন-কামনা-বাসনার প্রতি মানুষদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নিয়েছেন। ''নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করতে উৎসাহী, কিন্তু বিবেককে বর্জন করতে এতটুকুও আগ্রহী নন। তিনি বাস্তবিক অর্থেই 'রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়', এবং 'শান্ত মধুর ভাব-এ বেশি তৃপ্তি পান। তাই মধ্যবিত্ত মানুষদের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় নির্মম হন নি, বেদনাহত হয়েই বরং তার সহমর্মী হয়েছেন।''[৩২]

মনস্তাত্ত্বিক গল্পকারদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর 'চোর', 'একপো দুধ' প্রভৃতি গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক অনটনের মধ্যেও তীব্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপলব্ধ হয়। 'চোর' গল্পে অমূল্য ও রেণুর সংসার জীবন বর্ণিত হয়েছে। অমূল্য একটি দোকানে কাজ করলেও নববিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ও আর্থিক অনটন মোচনের জন্য সে হাত সাফাইয়ের কাজ করে। এই চৌর্যবৃত্তির জন্য তার কোন পাপবোধ নেই, রেণুর বারণ সে শোনেনা, বরং রেণুকে সে প্ররোচনা দেয় দোতলার ভাড়াটে বিনোদবাবুর ঘর থেকে কাঁসার বাটি

চুরি করে আনার জন্য। রেণু রাজি হয় না। ইতিমধ্যে অমূল্যর চাকরি যায়, সংসারে আরও অনটন বেড়ে চলে। একদিন রাত্রে বিছানায় শোওয়ার পর রেণু বিনোদবাবুর ঘর থেকে চুরি করে আনা দামি ঘড়িটা অমূল্যর হাতে পরিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখন অমূল্য খুশি হয় না। তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। নিজের স্ত্রীর চৌর্যবৃত্তি তার কাছে অত্যন্ত কুরুচিকর মনে হয়। এই অধঃপতনের জন্য সে অসহায়তা বোধ করে। ''আজ তার উল্লসিত হওয়ার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির পরিচিত দুখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ কণ্বিত মৃণালভুজ নয়--তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।''[৩৩]

'মহাশ্বেতা' গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিধবা নারীর সংস্কার ও অভ্যস্ত রূপ থেকে মহাশ্বেতা এবং তার নব বিবাহিত সংসারে চিন্মোহন বেরোতে পারেনি। হেডমিস্ট্রেস মহাশ্বেতা পাঁচ বছর আগে স্বামীকে হারানোর পর শ্বেত-শুভ্র বস্ত্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। চিন্মোহনও যুবতী এই নারীর শ্বেতবস্ত্র ভূষিত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের প্রেম অবশেষে বিবাহে রূপ নেয়। মহাশ্বেতাও বৈধব্যের গ্লানিময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কিন্তু সধবার খাদ্যাভ্যাসে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না যেমন, তেমনি চিন্মোহনের কাছেও মহাশ্বেতার নববধূ-সাজ অস্বস্তিকর মনে হয়। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে 'সর্বাঙ্গে হেসে উঠল চিন্মোহন, না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।'[৩৪] --এই বক্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের আঁচ লক্ষ্য করার পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেওয়ালে টাঙানো তার বৈধব্য চেহারার ছবি দেখতে পেয়েছে। জীবনের পরিবর্তন বাইরের খোলসে দেখানো গেলেও অন্তরাত্মা তাতে সব সময় সায় দেয় না। বিগত জীবনের স্মৃতি, আচ্ছন্নতা থেকে যায়, যা থেকে মানুষের মন মুক্ত নয়, 'মহাশ্বেতা' গল্পে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিমল করের মনস্তাত্ত্বিক গল্পও মানুষের মনের গোপন ভাবনা ও স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। তাঁর এই শ্রেণীর বহু গল্পের মধ্যে 'বকুলগন্ধ' গল্পটির উল্লেখ করা চলে। অঞ্জনা তার বিগত দিনের স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন। এখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয় সে। বকুল ফুলের মাধ্যমে তার অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি তাকে গ্রাস করে। মেয়ে কিংবা স্বামীর বকুল ফুলের প্রতি দুর্বলতায় সে তীব্র বিরোধিতা করলেও

অবচেতনের দ্বারা চালিত হয়ে সেই বকুল ফুলের কাছে সে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকতা এই সকল গল্পের মূল অবলম্বন। জীবনের প্রতি শুভবোধ থাকলেও অন্তর-জগতের দ্বারা চালিত মানুষ তার প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারেনা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিংবা বিমল করের গল্প সেই ভাবনাকেই প্রকাশ করে।

বিমল করের সমকালীন গল্পকার হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-কে চিহ্নিত করা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও তৎকালীন দেশ ও মানুষের সংকটময় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক যুদ্ধ, মন্বন্তর সকল দিক দিয়েই বিপর্যয়কে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। এর পাশাপাশি রয়েছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানসিকতার স্বরূপ, তাদের ক্লেদাক্ত জীবনের পরিচয়। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের অবক্ষয় তাঁর গল্পের বিষয় হলেও সুস্থ মানবিক চেতনায় ফিরে আসার প্রত্যাশাও ফুটিয়ে তোলে গল্পগুলি। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে কাপড়ের আড়তদার দেবী দাস মন্বন্তর-অভাবপীড়িত মানুষের কাছে সরকার-নির্ধারিত দামে কাপড় বিক্রি করেনি। বরং সরকারের সমালোচনা করে কাপড়ের অপ্রতুলতা সম্পর্কে তার মত জানিয়েছে। যাত্রার আসরে সেই দেবী দাস দুঃশাসনের মৃত্যু উপভোগ করে আনন্দ লাভ করে। আবার মুচি পাড়ায় এসে নগ্ন ষোড়শী মেয়েকে দেখে নিজের স্বার্থপর মানসিকতার প্রতি এতটুকু গ্লানি অনুভব না করে বলেছে, ''মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই -- কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।''[৩৫] --কিন্তু সমাজের এই দুঃশাসনদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভীম-স্বরূপে কোন সহৃদয়, সংবেদনশীল মানুষ এগিয়ে আসেনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবনের বাস্তব যন্ত্রণাময় চিত্র 'দুঃশাসন' গল্পটি। এই পর্যায়ে 'হাড়' গল্পটিরও উল্লেখ করা যায়। গল্পকথক চাকরির উমেদারি করতে এসে উচ্চবিত্ত রায়বাহাদুরের বাড়ির বিলাসিতার মধ্যেও বাইরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। কিন্তু চাকরির কথাতে রায়বাহাদুর উৎসাহী না হয়ে তাঁর সংগৃহীত হাড়ের গল্প বলে নিজের পৌরুষ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ঘরের ভিতরকার স্বপ্নময় অতীতের মুগ্ধতা বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল মন্বন্তর-পীড়িত বাইরের মানুষের বাস্তবের যন্ত্রণায় ও চিৎকারে। রায়বাহাদুরও বিরক্তিবোধ করেছেন মানুষের আর্তনাদে। ''বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্তে ভুলে যাওয়ার জো নেই,

তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোথায় তাহিতি-ম্যানিলা-হনোলুলুর যাদু রাজ্য, আর কোথায়--''[৩৬] স্বপ্নরাজ্যের হাড় থেকে বেরিয়ে এসে কথক দেখতে পেয়েছে ডাস্টবিনের পাশে কুকুরের সাথে লড়াই করে একটি শিশুর হাড় চোষার প্রয়াস। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষে সমাজের এই বিপরীত চিত্র তৎকালীন পরিস্থিতিকে বাস্তব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু গল্পে ভালবাসার নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। 'ধস' গল্পটিতে কিরণলেখা স্বামী ভবতোষকে নিয়ে চেঞ্জে যায় দার্জিলিং-এ। চাকরি হারানো, শারীরিক ভাবে অসুস্থ ভবতোষকে মানসিক ও আর্থিক সাহায্য করতে চায় কিরণলেখা। দার্জিলিং-এ এসে তার সহপাঠী রণজিতের সাথে দেখা হয়। রণজিতের প্রাণোত্তাপ, স্ফূর্তি দেখে মনের দুর্বল মুহূর্তে তার সাথে কিরণলেখা টাইগার হিল যেতে চায়। কিন্তু ঝড়ো পরিবেশে যেতে পারেনা। হঠাৎই ধস নামার পর রণজিতকে অবাক করে ভবতোষ। তার অসুস্থ শরীরেও কিরণলেখাকে সে উদ্ধার করতে চায়। রণজিত ভবতোষের প্রেমিকসত্তাকে উপলব্ধি করে নিজের মনের দীনতায় লজ্জাবোধ করে।

মানুষকে জানবার জন্য কলম ধরেছিলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) চল্লিশের দশকে প্রাক-স্বাধীনতা লাভের উত্তাল সময়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি আবির্ভূত হন। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ, অপরদিকে অভিশপ্ত বঙ্গবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গল্পে সমকাল চেতনার বিশেষ স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসবোধ, আবার সেই বিশ্বাসের পতন তার মনের স্বরূপে ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি সমকালীন মানুষদের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন। তাঁর গল্পে জীবনের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি জীবনসংগ্রামও বিশেষ মূল্যে স্বীকৃত হয়েছে। ''বিপুল জীবন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা কল্পনাযোগে বিশ্বাস্য ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ় মানবিক আবেগ ও দুর্মদ সহানুভূতিতে লেখক তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রগুলির সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যান, তাদের জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যান। আর সেই সব সুখ দুঃখের প্রকাশে সমরেশ বিচিত্র প্রকরণ আশ্রয় করেছেন -- বিশাল ক্যানভাস, পরিবর্তমান পটভূমি, বিশেষ পরিধিবেষ্টিত মঞ্চ।''[৩৭]

সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দুটি সাধারণ মানুষের অসহায়তার চিত্র রূপ পেয়েছে। এরা একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান, ভয়াবহ রাত্রে একটি

ডাস্টবিনের আড়ালে তাদের পরিচয় হয়। এরা কেউ দাঙ্গা চায় না, তাই দাঙ্গার ভয়ে নিজেদের পালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। দুটি মানুষ পরিচয়ের পর ক্রমশ কাছাকাছি এসেছে। অন্যদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে টহল দিয়ে চলেছে মিলিটারি সৈন্য। গল্পের শেষাংশে দেখা যায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাওয়ার পথে মুসলমান মাঝিটি তার সদ্য পরিচয় হওয়া হিন্দু বন্ধুর সামনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ঈদের পরবে সে আর পরিবারের মানুষদের সঙ্গে মিলতে পারেনি। ''সুতা মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা মাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে-- পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পাণিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমাকে যাইতে দিল না তাগো কাছে।''[৩৮] দাঙ্গার কাছে বলি হওয়া মানুষের আর্তনাদে বিষাদমগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে এই গল্পে।

বিমল করের 'অন্তরে' গল্পটিও এই দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। 'আদাব' গল্পে হিন্দু মুসলমান দুটি মানুষের মিলন দেখানোর পরও মুসলমান মাঝির মৃত্যু যে বিষাদমগ্নতা সৃষ্টি করেছিল, 'অন্তরে' গল্প লেখক তা পেরিয়ে গিয়ে শান্তির, সহানুভূতির ছবি এঁকেছেন। কবীর এবং মাধবী দুজনেই আশ্রয় নিয়েছিল একটি নির্ণীয়মান বাড়িতে। পরিচয়ের পর তাদের মধ্যে বিশ্বাসবোধ ফিরে আসে। খাদ্য সংগ্রহ করে তা ভাগ করে খেয়ে তারা পাশাপাশি ঘুমিয়ে গেছে, এবং স্বপ্নমদিরতায় খুঁজে পেয়েছে সুন্দর ভবিষ্যৎ-কে। মানুষের প্রতিশ্রুতি, সহানুভূতি, দাঙ্গার দিনেও কেমন ভাবে অপর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে তার ছবি এই গল্পটি।

'ছেঁড়া তমসুক' গল্পগ্রন্থের 'শহীদের মা' গল্পটি সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। বাদলের মৃত্যুতে তার মায়ের অন্তর্ভেদী যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও বাদলের ভাইয়েরা কৃপাল, দয়াল কিংবা তার বাবা হরপ্রসাদকে দুঃখিত হতে দেখা যায় না। একই বাড়ির তিন ভাই এবং বাবা চারটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। অপর সদস্যরা বাদলকে পার্টি ছাড়তে বললেও নিজেরা পার্টিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তাদের চোখে বাদলের পার্টি ক্ষমতাবাজ, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষদের সমষ্টি। নকশাল আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষদের চোখে নকশালরা এই ভাবে বিচার্য হতো। বাদলের মৃত্যুতে তার বাবা হরপ্রসাদকে শোকে মুহ্যমান না হতে দেখে মা বিমলার মনে প্রশ্ন জাগে। ''হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়ো? ওদের ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছুই নেই? পার্টি কি তার উপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, কথাটা কোনদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তার ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের

সংসার কি ওরা গড়তে পারত না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।''[৩৯] --বাদল সকলের কাছে 'পার্টির একটি ছেলে' বলে মূল্য পেয়েছে। কিন্তু মাতৃত্ববোধ এই পরিচয়কে বড় করে দেখেনা। তাই বিমলা গল্পের শুরু থেকেই তাঁর মনের অবচেতনে (Sub Conscious) বাদলকে প্রত্যক্ষ করেছে। স্মৃতির মাধ্যমে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে সন্তানকে। তাই বাদলের নামে শ্লোগান কিংবা শহীদ বেদী নির্মাণে তাঁর হতাশাবোধ বা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়নি। কেননা তাঁর মনে হয়েছে, শহিদ বেদি ভেঙে যাওয়ার পর বাদল বিস্মৃত অধ্যায়ে চলে যাবে, কিন্তু মাতৃহৃদয়ে বাদল চিরদিন অবস্থান করবে। একটি মায়ের সন্তান হারানোর ঘটনার মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের প্রকৃতিকে লেখক ধরার চেষ্টা করেছেন।

বিমল কর রাজনৈতিক ভাবনায় আচ্ছন্ন না হলেও সত্তরের উত্তপ্ত দিনগুলির কথা তিনিও কয়েকটি গল্পে ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন সময়ের পুলিশি নির্যাতন, আন্দোলনকারী যুবকদের প্রবৃত্তি তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন 'সে', 'ওরা', 'নিগ্রহ' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে। পুলিশ কিংবা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ আন্দোলনকারী যুবকদের বিদ্রোহ এই সমস্ত গল্পের প্রধান অবলম্বন।

বিমল কর তাঁর 'এই দশকের গল্প' সংকলনের ভূমিকায় তরুণ গল্পলেখকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ''দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব অধিকতর গভীরভাবে আমাদের সমাজ এবং জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। ফলে সমাজ জীবন ও মানুষ সম্পর্কে যে মৌল ধারণাগুলি একালের লেখকদের সংশোধন করতে হয়েছে তাতে বাংলা ছোটগল্পে জীবনচিত্র অনেক বেশি আন্তরিক, জীবনসমস্যা অনেক বেশি প্রকট এবং মানুষের আত্মিক প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। নৈরাশ্য বেদনা জটিলতা আত্মবিদ্রূপ এযুগের লেখকদের হাতে যত অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে সম্ভবত তেমন আর পূর্বে হয়নি।''[৪০] এই সময়ের গল্পে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ষাটের দশকের একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা মানুষের মতে বিষণ্নতাবোধের জন্ম দিয়েছিল। জীবনের অসারত্ব মানুষ উপলব্ধি করেছিল এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসে। মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল শূন্যতা ও মৃত্যুবোধ, মানুষের এই সময়কার মানস-দর্পণ হয়ে উঠেছে ছোটগল্পগুলি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বহু লেখক মানুষের মানসিক সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের মধ্যে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জীবন জিজ্ঞাসার তীব্রতাকে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। শূন্যতা, হতাশা বোধের পাশাপাশি জীবনের আস্তিক্যবোধের প্রতিও তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে দ্যোতিত করেছেন। বিমল করের সমকালীন এই গল্পকারের রচনার সাথে বিমল করের ভাবনার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে জগৎ, জীবন, মৃত্যু সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা প্রকাশ পায় তার পিছনে রয়েছে লেখকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ। ''বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি-- এই মহাজগৎ কেন অসীম? কেন মৃত্যু? কেন জীবন? কেন সব কিছু? এই প্রশ্নগুলি ছোবলে ছোবলে বিষ ঢেলে দিতে লাগল মনে আমার নিস্তব্ধ আর্তস্বর তার 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ধ্বনি পাঠাতে লাগল চারপাশে, চেতনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে খুঁজে বেড়াতে থাকে আশ্রয়।''[৪১] -- এই আশ্রয়ের জন্য তিনি যেমন ঈশ্বর বিশ্বাসকে আমল দিয়েছেন, তেমনি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর শৈশবের স্মৃতি।

'আত্মপ্রতিকৃতি' গল্পে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একজন বিকারগ্রস্ত মানুষের ছবি এঁকেছেন। যিনি একা নিজেই টেলিফোনের শব্দ শোনেন এবং টেলিফোনের অপর পাশে কারোর সাথে কথা বলেন যাকে বাড়ির লোকেরা চেনে না। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল বাড়িতে বা আসে পাশে কোথাও ফোন নেই। উনি তাঁর পেনটাকে ফোনের মত ধরে কথা বলেন, তার ছেলে বুঝতে পেরেছে যার সাথে বাবা কথা বলেন সেই মানুষটি তাঁকে তাঁর ছোটবেলার ডাকনাম রন্টু বলে সম্বোধন করে। এই পাগলামির জন্য তাঁর চাকরি গেছে, তবু এই ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি স্থান-কাল-পাত্রের কোন অপেক্ষা রাখেন না। মানুষটির Sub conscious mind দ্বারা প্রভাবিত এই আচরণ তাঁকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ন এক জগতের অধিবাসী করে তোলে।

'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু' গল্পে মাখনলাল তার বোধের গভীরে তীব্রভাবে এই জীবনের অসারত্ব উপলব্ধি করে। অফিস থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, পথে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারায়, আবার খুঁজে পায়। এই ভাবে একসময় সে এক অপরিচিত মানুষের চোখ দেখে চমকে ওঠে। তার সারা শরীরে শিহরণ লাগে। বাড়িতে ফিরে এসেও সে স্ত্রী পুত্রের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করে। তার স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পায় সে মারা যাচ্ছে, মনুষ্যেতর জীবের মত তুচ্ছভাবে। এই নিঃসঙ্গ জীবন তার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠে, সে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজতে থাকে।

বিমল করের 'অপেক্ষা', 'উদ্বেগ' প্রভৃতি গল্পেও এই মৃত্যুবোধ প্রকাশিত। 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ কোন একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু মনে করতে পারে না সে কে। মনের

মধ্যে আবছাভাবে স্মরণ করে সেই মানুষটি তাকে একটি চিঠি দিয়েছিল, এবং তাতে তার আসার কথা লিখেছিল। যদিও দিন কালের সঠিক সময় সেই রহস্যময় মানুষটি জানায়নি, তবুও শিবতোষ বুঝতে পারে সে আসবেই, কোন না কোন দিন সেই মানুষটি অনিবার্য মৃত্যুর সাথে একাত্ম। মানুষের অন্তরে এই মৃত্যুবোধ তার নিঃসঙ্গ জীবনে বারবার হানা দেয়। মানুষকে বিচ্ছিন্ন জগতের বাসিন্দা করে তোলে এই সব গল্পে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিমল কর চারের দশক থেকে নয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত একাদিক্রমে ছোটগল্প রচনা করেছেন দীর্ঘ এই সময়ে বহু গল্পকারের সাথে তাঁর যেমন যোগাযোগ ঘটেছিল, তেমনি তাঁর রচনায় এই দীর্ঘ সময়ের নানা বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছে। বিমল কর ছিলেন মনোজগতের লেখক। বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের দিকেই ছিল তাঁর সতর্ক, সচেতন দৃষ্টি। মানুষের মনের এই গোপন স্বতন্ত্র ভাবনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর নানা দার্শনিক ভাবনা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, যা তাকে সমকালীন সমস্ত গল্পকারদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বিমল করের গল্পকার জীবনের সূচনা লগ্নে, চারের দশকের ছোটগল্পে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একদিকে কমিউনিজম্ অপর দিকে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ও বিরাগ প্রকাশিত হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মন্বন্তরের চিত্র, তেভাগা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভের মত নানা ঘটনার চিত্র। মানুষের মনে হাহাকার বিপন্নতা যেমন গ্রাস করেছিল তেমনি দেখা যাচ্ছিল ক্ষমতালোভী মানুষদের অত্যাচারের বিবরণ। তখন থেকেই জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয় নানাভাবে সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে গল্প রচনার পাশাপাশি বিমল কর যেমনভাবে সমকালীন গল্পকারদের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি নিজেও সৃষ্টি করেছিলেন পৃথক একটি ঘরানা, যা তার স্বকীয় ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

উৎস পরিচয়

১. 'হাড়'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৪৪

২. 'দিবসের শেষে'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২

৪. 'নিষাদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৮০

৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯০

৬. 'অশ্বত্থ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০৯

৭. 'অরূপের রাস'--জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১২৬

৮. 'উদ্ভিদ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১২০

৯. 'যযাতি'---'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৩৯

১০.'শঙ্কিতা অভয়া'-জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩৬

১১.'আঠারো কলার একটি'--জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাব. সেপ্টেম্বর-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২০৬

১২.তদেব, পৃষ্ঠা-২১২

১৩.'পালকের পা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'—বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১০০

১৪.'গল্পকার তারাশঙ্কর'-'তারাশঙ্কর অন্বেষা'—রথীন্দ্রনাথ রায়, রমা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৮০

১৫.'আত্মদীপ তারাশঙ্কর'--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪, পৃষ্ঠা-২৮

১৬.'লেখকের কথা'--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ এজ পাব, সেপ্টেম্বর-১৯৫৭, পৃষ্ঠা-২৩

১৭.'আত্মহত্যার অধিকার', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাব প্রাঃ লিঃ, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-৩০

১৮.'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারবৃন্দ'-'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট',
পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৪

১৯. 'পরশুরামের কুঠার'-'সুবোধ ঘোষ বাছাই গল্প' মণ্ডল বুক হাউস, ১৪০৫, পৃষ্ঠা-২৬৪

২০. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া বিমল করের সাক্ষাৎকার, 'বিভাব' পত্রিকা,
বইমেলা সংখ্যা-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫১

২১. 'যক্ষ'-'গল্পসংগ্রহ'-- বিমল কর, প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, মহালয়া-১৩৮৭, পৃষ্ঠা-১৬২

২২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৭

২৩. 'তিন অধ্যায়'-'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশ ভবন, ফাল্গুন-১৪০১, পৃষ্ঠা-২২০

২৪. 'ভূমিকা'-'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', সম্পাদনা- নিতাই বসু, দে'জ পাব. ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯

২৫. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৬৩৬

২৬. কালের পুত্তলিকা-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৭৪

২৭. 'শালিক কি চড়ুই'--জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-১৯

২৮. 'গল্প লেখার গল্প'-'গল্প সমগ্র(১)'--সন্তোষ কুমার ঘোষ, দে'জ পাব. ১৯৯৪

২৯. কালের পুত্তলিকা-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৮৯১

৩০. 'যাদুঘর', 'গল্প সমগ্র(১)'--সন্তোষ কুমার ঘোষ, স্বরলিপি, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা-৯০

৩১. 'গল্প সমগ্র'(৩) --সন্তোষ কুমার ঘোষ, দে'জ পাব. ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-৯৬৬

৩২. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ--বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭

৩৩. 'চোর'-'গল্পমালা'(১) নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৪

৩৪. 'মহাশ্বেতা'-'গল্পমালা'(১) নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৩

৩৫. 'দুঃশাসন'-গল্প সমগ্র(৩)--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চৈত্র-১৪০৬, পৃষ্ঠা-২৩২

৩৬. 'হাড়'-গল্প সমগ্র(৩)--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চৈত্র-১৪০৬, পৃষ্ঠা-২৯৬

৩৭. কালের পুত্তলিকা-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি.এম.লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর-১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৯৪-৪৯৫

৩৮. 'আদাব'-সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র(২), মৌসুমী প্রকাশনী, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৮৫

৩৯. 'শহীদের মা'-সমরেশ বসুর গল্প সমগ্র(১), মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর-১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৩৪৯

৪০. 'ভূমিকা' এই দশকের গল্প--বিমল কর, পলাশী প্রকাশন, ১৯৬০ পৃষ্ঠা-১২

৪১. 'একটু খানি বেঁচে থাকা', গল্প সংগ্রহ--শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

-----০-----